মিথ্যের ঘরবাড়ি

অনির্বাণ ভট্টাচার্য

মিথ্যে বলছি না। সত্যি সত্যি সেদিন একটা আস্ত বিকেলকেই মরে যেতে দেখলাম আমার ছুটিমাখা জানালা-জোড়া ঘরটায়। মরে গেল প্রায় একবেলা সেভাবে কিছুই না পাওয়া পোয়াতি কুকুরটার খিদে—মরে গেল সমবেত স্মৃতি ভাগ করে নেওয়া পাড়ার রকের বুড়োটে প্রজন্ম—মরে গেল কুলফি আইসক্রীমওলার গলে জল হয়ে যাওয়া ডাক—মরে গেল পড়শী বাড়ির বেবাক সঙ্গম আর কপোত-কপোতীর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া ফালতু চিঠিপত্তরের এঁটো বয়ে নিয়ে যাওয়া কিছু স্তব্ধ পুকুর—মিথ্যে হয়ে গেল এই একটু আগেও বেশ কটমট করে চেয়ে থাকা এক টব নীরবতা নিয়ে হাত পা ছড়ানো দুপুর, এই চারপেয়ে হাঁটাহাঁটি, এই জাস্ট বাঁচতে হবে বলে বেঁচে থাকার মোহে যেন নাতনির মিহি আঙুলে গুনে গুনে তোলা কোনো সত্তোরোর্ধ প্রাণের সিলভার লাইন...অনেকটা 'Rear Window' ছবির সেই লেন্স-চোখে ফটোগ্রাফার জেমস স্টুয়ার্টের মতো—যিনি তাঁর পা-ভাঙা বিরক্তি আর আলসেমিতে গোটা দিনজুড়ে ঘরের জানলা দিয়ে আসন্ন দাম্পত্যজীবনের সম্ভাব্য সবকটা সত্যি-মিথ্যে খেলাকে রঙচঙে পোষাকে অভিনীত হতে দেখেন, কখনো ডিপ্রেসড যুবকের নেশাখোর একলা পিয়ানোর মদিরতায়, কখনো আত্মহত্যারতা বিরহিণীর লুকোনো কান্নায়, আবার কখনো বা বিভৎস কোনো মার্ডার প্লটের ধারালো সেনসেশনের মধ্যে দিয়ে। আর এভাবেই আমিও পেয়ে গেলাম এই মিথ্যে নিয়ে লেখাটার ডাইমেনশনটা।

পাঠক, এ লেখায় ক্রমোলজি খুঁজবেন না, খুঁজবেন না টাইম অ্যান্ড স্পেসের ফারাক অথবা মাপা অনুশাসন—কেই বা পারে সেসব মাপতে? সিসিফাস পেরেছিল? ক্রমাগত ছিনতাই, রাহাজানি আর স্বয়ং ঈশ্বরকেও মিথ্যে বলে তাকেও তো সেই ঠেলে যেতে হলো একা আস্ত জগদ্দল মিথ্যে-পাথর। অথবা ক্যাসানড্রা—কি এমন দোষ করেছিল সে? শুধুমাত্র অ্যাপোলোর সঙ্গে সঙ্গমে রাজি হয়নি। ব্যাস আর যায় কোথায়। ঈর্ষান্বিত প্রেমিকের দেওয়া প্রফেটিক ক্ষমতা বুমেরাঙ হল—রোমহর্ষক ট্রোজান যুদ্ধের আগাম সতর্কতা অথবা স্বপ্নের শহর ট্রয়-কে ধ্বংস হবে শুনেও লোকে ক্যাসানড্রার মুখেরকথা মিথ্যে বলে ধরে নিল। আর সেই ট্রোজান যুদ্ধ নিয়েই আরেকটি বড়সড় মিথ্যে—জয় নিশ্চিৎ দেখে যখন প্রায় আত্মহারা ট্রোজান-রা, তখনি ইতিহাসের সবথেকে বড় মিথ্যেটা কামড় বসাল। গ্রীকরা হার স্বীকার করে কুখ্যাত ট্রোজান ঘোড়া পাঠাল—যাকে ট্রোজানরা নিতান্ত সৌজন্য উপহার ছাড়া বেশী কিছু ধরেনি—রাত্রে যখন গোটা ট্রয় নিশ্চুপ—ঘোড়ার পেট কেটে বেরিয়ে এল লুকোনো বেশ কিছু গ্রীক সৈন্য—খুলে দিল ট্রয় শহরের দরজা—লাখে লাখে ঢুকে পড়ল গ্রীক সেনাবাহিনী—ঘিরে ধরল ট্রয়। বাকিটুকু ইতিহাস।

ইতিহাস? সে তো সিন্ধু থেকে গোদাবরী কিছু লুনাটিক সাম্রাজ্যবিস্তারের দিনলিপি—নিয়মিত শিকারে যাওয়ার আর শিকার শেষে ফিরে এসে সেরকমই একটি দিনলিপি লেখার অভ্যেস ছিল সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের। ফরাসি বিপ্লবের সবচেয়ে মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ বাস্তিল দুর্গ যেদিন ভেঙে পড়ল, লুই ডায়েরিতে সেদিন রাতে মাত্র একটি শব্দ লিখলেন—'**Rien**'—ইংরিজি তর্জমায় যার মানে দাঁড়ায়—'nothing'...কি বলব একে? ডাহা মিথ্যে—নাকি সত্যিকে অস্বীকার করার অহমিকা? ছোটবেলায় ইতিহাস বই মুখস্ত করতে পারা এক নিতান্ত ব্যাক-বেঞ্চারের শুধুমাত্র ঐ একটা সাবজেক্টেই বাকি সব্বাইকে ধরাছোঁয়ার বাইরে পাঠিয়ে দেবার অভ্যেসটা বেশিদিন টেঁকেনি—বড় হয়ে বুঝলাম ওসবেও বেশ কিছু মিথ্যে লুকিয়ে আছে—নীরো নাকি বেহালা বাজাতেন না—কারণ তখন বেহালা নামের বাজনাটা ছিলই না—নীরো যেটা বাজিয়েছিলেন সেটার নাম lyre—আর পুড়ে যাওয়ার পর আকস্মিক দুর্ঘটনায় তখন দিশেহারা সম্রাট, অন্তর্ঘাতের সন্দেহে একের পর এক নিরপরাধ খ্রীস্টানকে শূলে চড়াচ্ছেন, চালাচ্ছেন নির্বিচারে গণহত্যা—যার ব্যাপারে ইতিহাস আশ্চর্যরকমভাবে নীরব, অথচ সেই বেহালা-মার্কা মিথ্যেটা দিব্যি বেঁচে আছে—ইতিহাসের বই থেকে সফট্‌ওয়্যারের আগুনে নামকরণে। আরো অনেক কিছু বুঝলাম—যখন কারেন্ট ফ্লো আর অক্সিডেশন-রিডাকশনের দাঁতাল হিসেবে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল—হন্যে হয়ে খুঁজেছিলাম আমার সেই ভালোলাগা মিথ্যেগুলো—আমার পেগ্যাসাস, আমার ইকারুস-মিডাস-প্যান্ডোরাদের। পাই নি। পাইনি ইস্কুলজীবনের সেই বন্ধুটাকেও। বাড়িতে মিথ্যে ব'লে বেরিয়ে এক শুক্রবারের বারবেলায় হঠাৎ-ই পাগলপারা কোপাই নদীর ওকে বেশ ভালো লেগে গেল। খানাতল্লাশি করে বেশ কয়েকদিন পর ১০ কোলমিটার দূরে ওকে পাওয়া গেল। কথা বলানো গেল না। চটি দিয়ে বারপোস্ট বানানো কাদামাঠের ফুটবল, ক্যুইজ কনটেস্ট, প্রাইভেট টিউশনের লুকোনো নোটস্ মিথ্যে, জাস্ট মিথ্যে হয়ে গেল। ক্লাস টেনের টাটকা স্মৃতি হাতড়ে মনে পড়ে ওর মুখটার সাথে অর্ফিয়াস-ওডেসাস-গানিমিদ-দের বেশ কিছুটা মিল ছিল।

মিল নিয়েই কতরকম জাগলারি করতেন জয়দেব-দা। প্রতিবাদের পাশাপাশি। কোনোদিন আলাপ হয়নি। দেখেছি দূর থেকে কোনো কবিসম্মেলনে হয়তো বা। তবু এই সম্বোধনেই ডাকতাম ওঁকে মনে মনে। কণ্ঠীর সাথে অন্তিম আর ঘেন্নার পাশে পেন্নাম মিলিয়ে দিয়ে যিনি লিখেছিলেন—'রাজার সাথে আঁতাত করেন যিনি, আমাদের সেই গুহকের প্রতি ঘেন্না...' তাঁকে নিয়ে ২০১২-র ২৩ ফেব্রুয়ারীর সকালে আসা খবরটাকে আজ অবধি তিন তিনটে বছর ধরে জাস্ট একটা মিথ্যে উড়ো খবর হিসেবেই ধরে নিয়ে খুব কি অন্যায় করেছি? নাহলে তো ইস্তেহার বিলি করার কথা মিথ্যে হয়ে যায় জনগণতান্ত্রিক কবির। ঠিক যেমন 'কথামানবী' মিথ্যে হয়ে যায়...রোরোকে একটু আসছি বলে দাঁড় করিয়ে রেখে পালিয়ে যান এই কর্কটক্রান্তির দেশ ছেড়ে, বোঝা যায় মল্লিকাও মিথ্যে বলেছিলেন। আর মিছিমিছি কেন যে লিখছিলেন মহাভারতের স্ক্রিপ্টটা, ২০১৩-র ৩০ মে-র সেই সেরকমই একটা উত্তর কিছুটা পেয়েছিলাম ওয়াইল্ডের কাছে—অস্কার ওয়াইল্ড-পচাগলা নানারঙের মিথ্যের মুখোশ খুলতে খুলতে এক জায়গায় লিখলেন—'...only lying that is beyond reproach is lying for its own sake, that is lying in art...' মনে পড়ে এই সত্যিকথার রিয়েলিটি

থেকে মিথ্যেটাকে বার করে আনতে গিয়েই সেই কোন ছোট্টবেলাতেই ঢুকে পড়েছিলাম গল্পদাদুর অন্দরমহলে। বুঝলাম পাথরের ক্ষিধে বাড়তে বাড়তে একসময় গহনতর কোনো সত্যি রূপকথা তৈরি হয়, যতই মেহের আলি মিথ্যে মিথ্যে বলে ডাকুন না কেন, আসলে কেউই তফাতে যায় না, আরো কাছাকাছি সরে এসে তৈরি করে নিজস্ব মিথ্যের চৌহদ্দি। জানলাম চন্দরারা মিথ্যে বলে না, বলানো হয়। শিখলাম বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ির চৌহদ্দি নয়, আসলে ট্র্যাডিশন ধরে চলে আসা কোনো এক জখম নারীত্ব আর নিরাপত্তাহীনতাই শৈলকে দিয়ে বলিয়ে নেয় কিছু মিথ্যে—চলতি বাংলায় যার নাম 'সাদা মিথ্যে'—ঠিক এই নামেই একটা গল্প পড়েছিলাম আনন্দমেলায়—'সত্যিই মধ্যে তো সবটাই সত্যি, তাই বলে মিথ্যের মধ্যে সবটাই মথ্যে নয়, মিথ্যের মধ্যেও এমনকিছু সত্যি থাকে, যা কখনো কখনো সত্যির সত্যির চেয়েও আরো বেশী সত্যি হয়ে ওঠে...' মানে বুঝতে কিছুটা বয়েস খরচা করতে হয়েছিল—তবে এটুকু বুঝেছিলাম খুব সাচ্চা কিছু একটা বলে গেছেন গল্পের লেখক নাট্যকার রমাপ্রসাদ বণিক।

সাচ্চা একটা ভালোবাসার মধ্যে দুএক পশলা মিথ্যে যদি ঢুকে পড়েও বা, দোষ দেওয়া যায় কি? দোষ দেওয়া যায়না সেই ট্র্যাম্পকেও যে অন্ধ ফুলওয়ালির কাছ থেকে ছোট্ট এক গোছা ফুল কিনে নিয়েছিল—পরমূহুর্তেই একটা গাড়ির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ পেয়ে ফুলওয়ালির সেই খুচরো ফেরত দেওয়ার আহ্বান কে একটা সাদা মিথ্যে দিয়ে মুড়ে পা টিপে টিপে পেরিয়ে গেছিল সে—আর আলোয় আলোয় অমর হয়ে গেল স্যার চার্লস্ চ্যাপলিনের 'city lights'... দেখলাম কিভাবে 'সাদা কালো জঞ্জালে ভরা মিথ্যে কথার শহরে' বড় হয় ট্র্যাম্প আর অন্ধ ফুলওয়ালির আশ্চর্য লাল-নীল সংসার। অবশ্য ঠিক সেরকমটা হল না সোমনাথের—শেষ দৃশ্যে 'অর্ডারটা পেয়ে গেলাম বাবা', বলে দালানে যখন পা রাখল সে, প্রথমে একটা পরাজয় মিশ্রিত ভয়ের চোখমুখ পাল্টে গিয়ে আশ্চর্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পিতার মুখ—'যাক এতদিনে নিশ্চিন্ত'—আর ছবির অন্যতম প্রোটাগোনিস্ট হয়ে যায় না বলা বোবা একটা ভয়ঙ্কর মিথ্যে—যেখানে নিজের হাতে বন্ধুর বোনকে লোলুপের হাতে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় 'জন অরণ্য'-র শান্ত অসহায় যুবক—পর্দার ফাঁক থেকে যার কিছুটা টের পেলেও বলতে পারে নি বৌদি কমলা। সেলুলয়েডের পোকা হতে হতে একইরকমভাবে খুঁটে খেয়েছিলাম অজয়-মনিকার রোম্যান্সে পাকাপাকি ঘর করে থাকা একের পর এক মিথ্যে চেইন-রিয়্যাকশন—যার প্রকোপে পড়ে জাস্ট একটু ভালো খাওয়া পরা আর মিষ্টি প্রেমের মত ছোটখাটো অথচ 'অকাশকুসুম' স্বপ্নাভিলাষী যুবক শেষমেশ হয়ে যায় 'জোচ্চোর, ইম্পোস্টার...'।

আমারও প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। চেনা মফস্বল ছেড়ে 'এই মিথ্যে কথার মেকি শহরে' পা ফেলার আগেই ভরসা হিসেবে পেয়েছিলাম এক নাগরিক কবিয়ালকে। 'মিথ্যে কথার হারিয়ে যাওয়া ব্যর্থ এই বাজারে' যার গানগুলো কত কি যে অর্থ নিয়ে এসেছিলো, তার ইয়ত্তা নেই। চ্যাটার্জি থেকে কবীর হয়ে গেছে সময়, আশপাশের মিথ্যেগুলো আমায় গিলছে, আর আমি গিলছি ওঁর দোঁহাগুলো। তখনও মনের ইচ্ছে অনিচ্ছের সমান্তরালে জন্মানো গোঁফের রেখা ততটা জোরালো হয়নি, তবু বুঝতে পারতাম র‍্যাট রেস, রকবাজি আর রিডিকিউল্ড্ এই সভ্যতার চৌকাঠে পা দুলিয়ে ফুল-পাখি-তারার হারমোনিকা বাজানোটা

খুন নয় ইতিহাস। মাত্র দুদিনের অসুখে মরে গিয়ে হঠাৎ করে যেন পুরো ছেলেবেলাটাকে মিথ্যে করে দেয় ঠাম্মারা। ভ্রূণ থেকে জন্ম নেয় শরীর, শরীর ঢেকে যায় ফুলে—তাছাড়া 'ফুলকে নিয়ে মানুষ বড় বেশী মিথ্যে বলায় ব'লে' ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান তৈরি হয় না। আর কোমায় চলে যাওয়া দাদুর মুখখানা দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় দেওয়ালের পলেস্তারা খসতে খসতে আস্ত একটা চাঙর ভেঙে পড়ার গল্প যার অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে ট্র্যাডিশন জমা হতে হতে আমাকে দিয়েই লিখিয়ে নেয় আরেক প্রজন্মের চিঠি—যার গালে টোল পড়তে বুঝতে হবে হাসি, যে বাপি আর মা সিনেমা দেখতে গেলে আশা করব যেন টিভি না দেখে আকাশ দেখে, যাকে শেখাব এ দেশের পরতে পরতে ধ্বনিত হয় মুন্ডক উপনিষদের বাণী—সত্যমেব জয়তে, অথচ সেই দেশেই প্রতি ২০ মিনিট অন্তর এক লোকজন অরুনা শাহবাগ, বিলকিস বানু-রা কখনো অতর্কিতে, কখনো দিনের আলোয় সুপরিকল্পিতভাবে গ্যাংরেপড্ হয়—আর আমি মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসি প্রেক্ষিত আলাদা বলে। বড়দিনের ফ্লুরিজ আলো থেকে আরো আলোকিত হয়, অথচ ঝাপসাই থেকে যায় পার্কস্ট্রীটের মেয়েটার মুখ। মনে হয় মিথ্যেই ভালো, বড় ভয়ানক এই সচ্ কা সামনা।

সত্যির সামনাসামনি হওয়াটা কঠিন। আরো কঠিন সামাজিক মিথ্যের বটের ঝুরি সামলে শান্তিতে একটু জিরোনো। বাবা বলত ঠাকুর দুরকম—রবি ঠাকুর আর অবন ঠাকুর। পৈতে পরা বন্ধুদের, লেগ্যাসির এক চৌকাঠ বাইরে না পা ফেলা আত্মীয়দের বোঝাতে গিয়েও হাঁফিয়ে উঠেছি কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কেন শেষের পরেরটা শুধুই অন্ধকার—ওখানে কোনো এল ডোরাডোর রাজকন্যা আমার জন্য সোনার পালঙ্ক খাটিয়ে বসে নেই অন্য কোনো জন্মে কোল আলো করে আর কোনো গোর্কির মা'র ঘরে পাভেল হয়ে আসব না—এই জন্মান্তরবাদ, এই ঈশ্বর আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে জায়গা না পেলেও গল্পের ডায়েরীতে, না ছাপা কবিতার পাণ্ডুলিপিতে একটা একটা বেয়ারা সাবজেক্ট হিসেবে আসতেই থাকল—যেমন আসতে থাকল কার্লো কলিডির সেই পিনোচ্চিও নামের কাঠের পুতুলটা, যে এক একটা মিথ্যে বললেই নাকটা একটু একটু ক'রে লম্বা হয়ে যায়, আরও এলো সেই জেন বৌদ্ধ শিক্ষকেরা যারা এক একটা মিথ্যে শিক্ষা দিলেই চোখের ওপর থেকে একটু একটু করে ভুঁরু মাটিয়ে পড়ে যায়—বাবাকে বোঝাতে পারিনি চারপাশের এক ভ্রুহীন, লম্বা নাকের লোকগুলোর সাথে হেসে কথা বলতে বলতে কেন বিস্বাদ লাগে, জোলো মনে হয় গ্রীক রুপকথার সেই গল্পটা—সেই যে প্রমিথিউস এক মানবমূর্তি বানানোর হঠাৎ করে জিউসের কাছ থেকে ডাক পেলেন—কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেলেন—পাশে ছিলেন সহকারী ডোলোস—ঠিক একইরকম অবিকল আরেকটি মূর্তি বানালেন ডোলোস—তবে প্রমিথিউস চটজলদি ফিরে আসায় তাড়াহুড়োয় পা বানানোর সময় পেলেন না—প্রমিথিউস এসে পাশাপাশি দুটি অবিকল মূর্তি গড়ে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন—মূর্তি দুটিতে প্রাণ দিলেন—তাঁর নিজের বাননো মানুষটি এগিয়ে চলল আর নাম হল অ্যালিথিয়া—সত্যের প্রতীক—আর ডোলোসের বানানো মূর্তিটা প্রমিথিউস তাঁর নিজের নামে চালানোয় সেটি হয়ে গেল মিথ্যের প্রতিমূর্তি—নাম সিউডোলোগোই—যে পা নেই বলে আর এগোতে পারল না। ঠিক যেমন মহাকাব্যের সত্যবাদী নায়কের রথের চাকা মাটিতে পড়ে গেল স্রেফ একটি কৌশলী অর্ধসত্য বলার খেসারত দিতে গিয়ে। আর একাকার হয়ে গেল মিথ আর মিথ্যে।

নিজের সাথে একাকার হয়ে যাওয়াটা অভ্যেসে নিয়ে গেছি। আর নিজেদের কাছে মিথ্যে বলাটা? খুব বেশি রাতে ঘড়ির কাঁটার শব্দের মতো সংখ্যাটা অসীমের দিকে এগিয়েই চলেছে—মনে পড়ছে রিচার্ড বাখ-এর সেই কথাটা—'The worst lies are the lies we tell ourselves'। মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া করি। সত্যি বলার এই সিলেবাসি খেলাটা খেলতে খেলতে আসলে তো কয়েককোটি মিথ্যের ঘাসকেই মাড়িয়ে যেতে হয় আমাদের—সাবধানে রাস্তা পেরোতে হয়—কারণ ঘরে কেউ না কেউ তো প্রতীক্ষায় আছে আমাদের জন্য—আর একমুখ দাড়ি গোঁফ পাগলটাকে, দড়িপাকানো বুড়ি ভিখিরিটাকে ডাহা মিথ্যে বলে যায় ট্র্যাফিক সাবধানবাণী। খুব ভুল কিছু বলেননি নিক ডায়ামস—'Everyday lies, but it doesn't matter since nobody listens'। কেউ শুনছে না। কেউ বুঝছে না কিভাবে কান ঘেঁষে চলে যায় বুলেট, চামড়ায় লেগে থাকে মিথ্যের পোড়া বারুদের গন্ধ। রাখাল ছেলের সত্যি কথাকে লোকে বাড়তি আরেকটা মিথ্যে বলে ধরে নেয়—তৈরি হয় একের পর এক 'ওথেলো এরর'। সেই আরবী প্রবাদটা হাওয়ায় মিশতে মিশতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়—'সাবধান, কোনো কোনো মিথ্যুক সত্যি কথা বলে'। পাশের লোকটা, একই ছাদের তলায় থাকা পায়ে পা ঠেকা শরীরটাও আর বিশ্বাসযোগ্য থাকে না। তারপর একসময় রাত বাড়তে বাড়তে ঘুমিয়ে পড়ে ছেলে, রক্তচোষারা খাজনা চাইতে এলে দোষ পড়ে বেবাক বুলবুলিগুলোর ওপর। ছেলে আর ঘুম থেকে জাগতে পারে না। কুয়াশায় ঢেকে যায় সত্যি মিথ্যের পর্দা। সাবকনশাসে ভাসে দাদুর হাত ধরে রথের মেলা যাওয়ার সময়ে পিছু ফিরে দেখা পয়সার ব্যাগ নিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ানো মায়ের ইঙ্গিত চোখ, ভাসে বোনের খুনসুটিগুলো পাল্টে দূরত্বের দাবি রাখার গল্প—গুলিয়ে যায় রিয়েলিটি—আলো আঁধারিতে ঝুলতে থাকে 'সত্যি কথার যন্ত্রণার জগৎ'—সেখানে 'নেই মিথ্যে ক'রে দেবার পেন্সিল—রং-পেন্সিল...'